দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 26 JAN 2010
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

২০১১ সালের মধ্যে সকল শিশুকে স্কুলে আনয়ন প্রসঙ্গে

দেশব্যাপী শিশু শিক্ষা ও সাক্ষরতা জরিপ-২০১০ উদ্বোধন করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে গত শুক্রবার নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের সানারপাড়ে এক সভায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ডা. মো. আফসারুল আমিন বলেন যে, ২০১১ সাল অর্থাৎ আগামী বৎসরের মধ্যেই দেশের সব শিশুকে স্কুলে নিয়া আসা হইবে। বলা বাহুল্য, মন্ত্রী বর্তমান সরকারের পূর্ব প্রতিশ্রুত লক্ষ্য অর্জনের কথাই পুনর্ব্যক্ত করিয়াছেন। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে এ ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। একই সঙ্গে সরকার ২০১৪ সাল নাগাদ দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করার জন্যও অঙ্গীকারাবদ্ধ। চারদিনব্যাপী চলমান জরিপ কাজের ফলাফল এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে যথেষ্ট সহায়ক হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বাংলাদেশে কয়েক দশকের ব্যবধানে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বেশকিছুটা অগ্রগতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পরও বাস্তবতা এই যে, এখনও অনেক শিশু রহিয়া গিয়াছে স্কুলের বাহিরে। যাহারা স্কুলে যায়, তাহাদেরও অনেকে প্রাইমারী গন্ডি পার হইতে পারে না। বর্তমানে সরকারি খাতা-কলমে শতকরা ৯১ ভাগ শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাইতেছে। দারিদ্র্য ও অন্যান্য নানা সমস্যার কারণে প্রায় শতকরা ৯ ভাগ শিশু বিদ্যালয়ে যাইতে পারিতেছে না। যদিও যাহারা স্কুলে যাইতেছে তাহাদের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে ঝরিয়া পড়ার হার ৪৮ ভাগ। আবার যাহারা শেষ পর্যন্ত টিকিয়া যাইতেছে তাহাদের মধ্যে ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিতির হারও আশাব্যঞ্জক নয়। শুধু স্কুলে শিশু ভর্তি হারের অগ্রগতিতে আত্মতুষ্টিতে মাতিয়া থাকার কোন কারণ নাই। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তাহাদের লেখাপড়ায় ধরিয়া রাখিবারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। এক হিসাবে দেখা যায় যে, দেশে এখনও ১৫ হাজার গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই। সুতরাং পর্যাপ্ত বিদ্যালয় অবকাঠামো গড়িয়া তুলিতে না পারিলে শিশুরা ভর্তি হইবে কোথায়?

গণসাক্ষরতা অভিযানের এক গবেষণা হইতে জানা যায়, বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় নিয়োজিত শিশুর ৭০ শতাংশই হইতেছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। আর বেসরকারিভাবে আছে ১০ হইতে ১৫ শতাংশ। অবশিষ্ট ৮ হইতে ১০ শতাংশ শিশুদের নিয়া কাজ করিতেছে এনজিও। এনজিও ও বেসরকারি স্কুলগুলিতে শিশুর ঝরিয়া পড়ার হার তুলনামূলকভাবে কম। অর্থাৎ সরকারি স্কুলগুলিতে রহিয়াছে পর্যবেক্ষণের অভাব। আবার ইহাও সত্য যে, ২০ বৎসরের মধ্যে নূতন কোন স্কুল সরকারীকরণ না করায় এবং নানা হতাশা ও সমস্যা বিরাজমান থাকায় প্রাথমিক শিক্ষায় জবাবদিহিতা তৈরি হইতেছে না। আমাদের দেশে নব্বই দশক হইতে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যাশা অনুযায়ী এখনও মূল উদ্দেশ্য পূরণ হয় নাই। শিশু শিক্ষা ও সাক্ষরতা জরিপ শেষ করিয়া প্রায় দুই বৎসর সময় পাওয়া যাইবে। ইহার মধ্যে সকল শিশুকে স্কুলে আনিতে হইলে গ্রামে-গ্রামে ও পাড়ায়-পাড়ায় সৃষ্টি করিতে হইবে গণজাগরণ ও সচেতনতা। সকলের সহযোগিতা ব্যতীত সরকারের একার পক্ষে এই কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হইবে না। দেশের দুর্গম, প্রত্যন্ত চর ও পাহাড়ি এলাকায় এজন্য গ্রহণ করিতে হইবে বিশেষ পদক্ষেপ।

আমাদের সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে একই পদ্ধতির গণমুখী, সার্বজনীন, নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করা হইয়াছে। কিন্তু সংবিধানের এই ধারা প্রতিপালনে আমরা যথেষ্ট গাফিলতির পরিচয় দিয়াছি। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাদান কর্মসূচির কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা বহির্বিশ্বের অনুদানের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছি। দেখা যাইতেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতে উন্নয়ন ব্যয় দ্বিগুণ হইলেও আমরা কার্যত ততটা সুফল পাইতেছি না। ইহা পর্যালোচনার দাবি রাখে। সম্প্রতি 'রিচিং মারজিনালাইজ্ড' শিরোনামে প্রকাশিত এক বৈশ্বিক রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, বিশ্ব প্রাথমিক শিক্ষায় সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল বা এমডিজি) অর্জনে অসমর্থ হইবে। কেননা মৌলিক শিক্ষায় ধনী দেশগুলির সহায়তা প্রদানের অঙ্গীকার এক পঞ্চমাংশের বেশি হ্রাস পাইয়াছে। ফলে ২০১৫ সাল নাগাদ এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন তো দূরে থাকুক কেবল ৫ কোটি ৬০ লক্ষ মেয়ে শিশু প্রাথমিক স্কুলে যাইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবে। সারা বিশ্বের যখন এই পরিস্থিতি, তখন শতভাগ সাফল্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশের নিজস্ব উদ্যোগ ও কর্মপ্রচেষ্টা জোরদার করিতে হইবে। এখানে অবকাঠামো নির্মাণ, পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ ও দরিদ্র ঘরের সন্তানদের স্কুলে পাঠানো— এই তিন উদ্যোগের বাস্তবায়নই হইবে চ্যালেঞ্জস্বরূপ। এই ব্যাপারে সরকারের এখন হইতেই ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়।